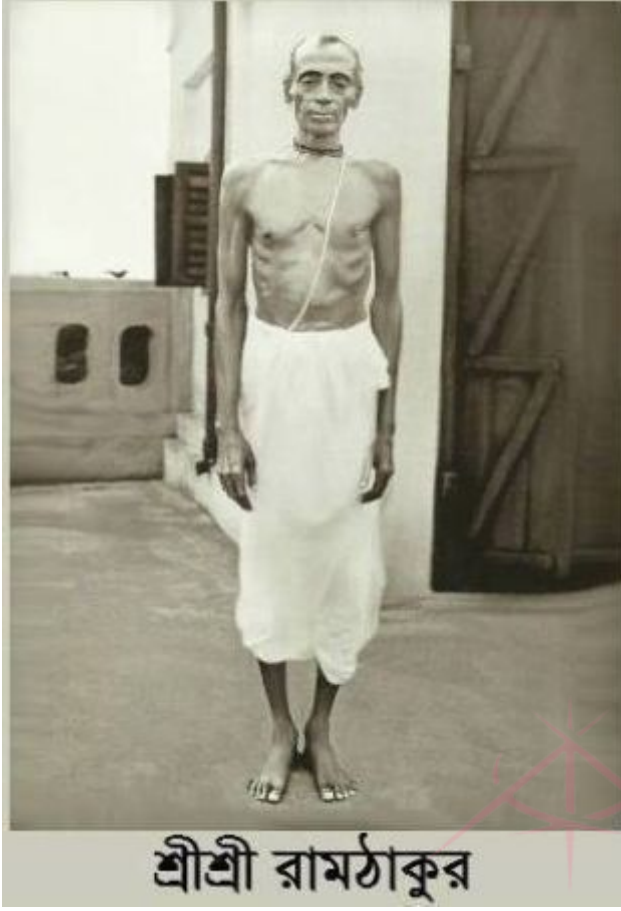




শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেবে-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেবে-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী.....

শ্রী ঠাকুরের পতি রাধামাধব চক্রবর্তী অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ও ঐকান্তিক ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও নৃসিংহান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর কুলগুরু ছিলেন সিদ্ধান্তরাচার্য মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন। তাঁর সাধনক্ষেত্রে “পঞ্চবটী” এখনও তাঁদের বড়ি পূর্বপার্শ্বে বিদ্যমান। তিনি সারাজীবন নিরামষিভোজী ছিলেন। তিনি শীতকালের কনকনে ঠাণ্ডা সহ্য করার অদ্ভুত শক্তি অর্জন করেছিলেন। এই তান্ত্রিকসাধক মাঘ মাসে ভয়ানক শীতের রাত্রিতেও পুকুরের জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করতেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের মাত্র ৮ বৎসর বয়সে ১২৭৩ বাংলা সনে প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। পতির মৃত্যুতে শ্রীশ্রী ঠাকুরের শশিকালকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের জননী শ্রীমতী কমলাদেবী ছিলেন অতিশয় পুণ্যবতী, সহজ-সরলা, উদার ও পরোপকারী। ধর্মে তাঁর ভক্তপরিায়ণতা ও ঐকান্তিকতার জন্য সুখ্যাতি ছিল। তিনি কৃচ্ছ্রসাধন ও ব্রতাদি পালনে সদা-সতর্ক থাকতেন। তিনি নিজের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা না করে পরের সুখ-সুবিধার প্রতিলক্ষ রাখতেন বেশি। তিনি ১৩১০ বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৯০৩ ইং সালে স্বর্গারোহণ করেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের পৈত্রিক আদিনিবাস ছিল ফরিদপুরের (দক্ষিণ বক্রিমপুরের) জপসা

গ্রামে। জপ্সা গ্রামটি ডিঙিগামানকি থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। নানা কারণে জপ্সা গ্রামের সুখ্যাতি ছিল। বদি্যালঙ্কার পরবার ছিল সেই গ্রামের এক বখিযাত ব্রাহ্মণ পরবার। রাধামাধব চক্রবর্তীর পতির নাম ছিল রামজয় চক্রবর্তী। তিনি জপ্সা গ্রামে পরলোকগমন করেন। পদ্মার শাখানদী কীর্তিনাশার করাল গ্রাসে বাপদাদার ভটিমোট নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণে শ্রীশ্রী ঠাকুরের পতি রাধামাধবকে জপ্সা গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হল ডিঙিগামানকি গ্রামে। সেখানে তিনি কমলাদেবীর পাণগ্রহণ করে বসবাস শুরু করেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের মাতা কমলাদেবীর পতিমহা শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন একজন প্রখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তৎকালীন রাজা রাজবল্লভের প্রতীতি রাজনগরে দ্বারপণ্ডিত ছিলেন তিনি। তৎকালীন যুগের প্রধানুসারে রাজা থেকে পুরস্কারস্বরূপ ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি লাভ করেন পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। ওয়ারশি সূত্রে উক্ত সম্পত্তি এক-তৃতীয়াংশে মালকি হন তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র সদানন্দ ভট্টাচার্য। তিনি স্বর্গারোহণ করলে উক্ত সম্পত্তি অধিকারী হন তাঁরই একমাত্র কন্যাসন্তান কমলাদেবী।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের যমজভাই লক্ষ্মণসহ চার ভাই ও এক ভগ্নী ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালীকুমার ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও পরোপকারী ব্যক্তি। যৌবন বয়সে তিনি কঠিন বাতরোগে আক্রান্ত হন। পতির চেষ্টায় মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এলেও পা দুইটি শুকিয়ে চরিতরে পণ্ডিত্ববরণ করে শয্যাস্থি হয়ে পড়েন। তিনি ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে পূজার্চনা নিয়ে পড়ে থাকতেন। দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগবন্ধু ছিলেন অতিশয় সরল ও উদার প্রকৃতির লোক। তিনি ১৩৩৩ বাংলার ২৪ ভাদ্র তারিখে পরলোকগমনের সময় শ্রীশ্রী ঠাকুর উপস্থিত থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের যমজ কনিষ্ঠ সহোদর লক্ষ্মণ ঠাকুর ছিলেন পরোপকারী, কষ্টসহিষ্ণু, ধর্মপ্রমেভক্তিসম্পন্ন মহৎচরিত্রের অধিকারী। হরনিম শ্রবণে তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হয়ে আত্মসংবরণ করতে না পেরে সর্বশরীর কাঠের মত শক্ত ও চক্ষু পলকহীন অবস্থায় সঞ্চারিত হয়ে থাকত। অকৃতদার লক্ষ্মণ ঠাকুর আত্মপীড়িতের সর্বোচ্চ সবসময় উন্মুখ হয়ে থাকতেন। তিনি প্রায় ৫৭/৫৮ বৎসর বয়সে কলরো রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা একমাত্র ভগ্নী কশীমণি দেবী ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল ও মধুর স্বভাবের। তাঁর মধুর ব্যবহারে জন্য সবাই তাঁকে ভালোবাসতেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের বদি্যাশিক্ষার ব্যাপারে মাতা-পতির যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না। সুযোগ-সুবিধার অভাবও ছিল না। কার্তিকপুরের মুসলমান জমিদার বাড়ির সামনে তৎকালে একটি মাধ্যমিক ইংরেজি বদি্যালয় ছিল যা পরবর্তীতে কার্তিকপুর উচ্চ ইংরেজি বদি্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই বদি্যালয়ে শ্রীশ্রী ঠাকুরকে ভর্তি করা হল। কনিষ্ঠ তিনি অন্যান্য বালকের ন্যায় স্কুলে যাতায়াত করলেও বদি্যাশিক্ষা বিষয়ে তাঁর তমেন কোন আগ্রহ ছিল না। এই অনাগ্রহের কারণে পরবর্তীতে তিনি আর বদি্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন না।

বাল্যকালে শ্রীশ্রী ঠাকুর অন্যান্য বালকের ন্যায় খেলাধুলায় মত্ত থাকলেও অন্যান্য বালকের মত তিনি চঞ্চল ছিলেন না। ধৈর্য, সটৈর্য ও গাম্ভীর্যের চরিত্র ফুটে উঠত তাঁর ভিতর। ছোট-বড় সকলেই তাঁরই সরলতা, মৃদু আলাপ ও সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হত। তিনি বাল্যকাল থেকে অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু, অধঃবসায়ী ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। মাতা-পতি, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশীসহ গুরুজনদের প্রতি তিনি একান- শ্রদ্ধাপরায়ণ ও অনুগত ছিলেন। তিনি সংসারের অতিশয় কষ্টসাধ্য কাজগুলো নির্বিকার চিত্তে সম্পন্ন করতেন। বাল্যকালে সমবয়সীদের নিয়ে

মৃত্তিকার দবে-দবৌর মূর্তি তৈরি করে কীর্তনে নচে-গয়ে পরমানন্দে পূজার্চনা করতেন। পারমাত্মকি সংগীতের প্রতিপ্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল। তৎকালে সেই অঞ্চলে রামায়ণ গান শুনতে যেতেন বিভিন্ন জায়গায় গানের আসরে। শ্রীশ্রী ঠাকুর একসময় মাকে বললেন, “মা, রামায়ণ গানে কেবল আমার ও লক্ষ্মণের কথাই তো বলে”। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ মনোযোগ সহকারে শুনতে হুবহু বলার ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি শ্যামাসংগীত খুব ভালবাসতেন। কহে ভক্তগীতি গাইলেই তন্ময় হয়ে শুনতেন। তিনি বাইরের যাবতীয় কাজকর্ম করলেও চিত্ত ছিল অন-রজগতে।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের পত্নীদেবের স্বর্গারোহণ এবং কিছুকাল পরে তাঁর পতির গুরুদেব মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন-এর দহেত্যাগ বালক রামচন্দ্র দেব-এর জীবনে নিয়ে আসে এক পারমাত্মকি পরবর্তন। তিনি হয়ে গেলেন উদাস, নীরব, নথির। তাঁর এই ভাবান-রে অভ্যাসসহ স্থানীয় সকলকে ভাবিয়ে তুলল। নয় বৎসর বয়সের রামের এই ভাবান-রের কথা চিন্তা করে কটে কটে মনে করলেন, শাস্ত্রানুসারে উপনয়ন সংস্কার হলো হয় তো মতগতির পরবর্তন হতে পারে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালীকুমার চক্রবর্তী “আচার্য” হয়ে রাম-লক্ষ্মণ-এর উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করলেন।

তৎকালীন সমাজে উপনয়নের পূর্বে পঞ্চগব্য খাওয়ার ব্যবস্থানুযায়ী তাঁদেরও পঞ্চগব্য ভক্ষণ করলেন। সেইদিনই ঠাকুর চরদিনের মত ত্যাগ করলেন অন্ন।

যদ্যপি দু'একবার ব্যতিক্রম হয়েছে, তা কেবল মা-জননী ও বিশেষ ভক্তদের অনুরোধে। কনি' স' অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছেন বারো বার। উপনয়নের পর মা কমলাদেবীকে নিয়ে দণ্ড ভাসানোর সময় দর্শন হল এক সৌম্য সন্ধ্যাসীর। তিনি অপলক দৃষ্টিতে রামের দিকে তাকিয়ে মা কমলাদেবীকে প্রার্থনা নব্বিদিন করে বললেন, “তোমার এ ছলেটি আমাকে দিয়ে দাও”। একি! আবার অলক্ষ্যে কথায়? রাম যেন আমার নয়নের মণি এমন ছলেকে কী কটে সন্ধ্যাসীর হাতে তুলে দেয়! সেইদিন সন্ধ্যাসী রকিতহসে- ফরি গলেও তাঁর গহীন অন-রে গ্রথিত হয়ে রইল রাম-তনু।

উপনয়নের পর প্রব্রজ্যাসক্ত মনের উপসম না হয়ে বরং গড়ে উঠল প্রকৃতির সংগে নবিড়ি নকৈট্য। অসীম আকাশে মুক্তালয়ে যেন গরৈকি আলোকবর্তিকা হাতছানি দিয়ে আহ্বান করছে। রাম এখন গায়ত্রীমন্ত্র জপের মধ্য দিয়ে আহ্নিকি নিয়ে পড়ে থাকেন। এই জপের জ্যোতিতে রাম এক ঐশ্বরীয় শক্তির আবেশে উদ্ভাসিত হতে থাকেন।

অলৌকিকি নয়ন্তার আবাহনে চলে যেন তাঁর সমরুপিত জীবন। অন-রাত্মার মধ্যে যেন এক অনর্বিণ জ্যোতি স্ফুরতি হয়ে ভগবদ্বামনে নজিকে লয় করিয়ে নিচ্ছেন।

পত্নীদেবের দহেত্যাগের পর প্রায় চার বৎসর অতিবাহতি হল। এমন এক সময়ে রামের জীবনে এল শুভ লগন। যথারীতি বালক রাম রাত্রিতে পরম শান্তিতে গভীর নদ্রায় নমিগ্ন। হঠাৎ স্বপ্নযোগে তাঁর সমনে উদ্ভাসিত হল সৌম্য, শান- এক সন্ধ্যাসী।

কানের কাছে সন্ধ্যাসী বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে বললেন, “বৎস! প্রতিদিন নব্বিটমনে এই শক্তিমন্ত্র জপ করে যাও, মুক্তির পথ তোমার অচিরেই উন্মুক্ত হয়ে যাবে”। স্বপ্নশ্রুত মন্ত্রের অমোঘ প্রভাবে বালক রামের অন-রজীবনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন-রলীন এক মহাশক্তি জন্মান-রের সাত্ত্বিক সংস্কাররূপে প্রকট হয়ে ধ্যানস্রোতে বকশিত হতে থাকে। বালক রাম প্রচ্ছন্ন থাকতে চাইলেও দৈবীকৃপাপ্রাপ্ত ঐশ্বরীয় প্রসাদের নতুন স্বরূপটি ক্রমে বাড়ি লোকের কাছে প্রকাশ হতে থাকে।

প্রায় বার বৎসর বয়সে শ্রীশ্রী ঠাকুর তাঁর এক দূর সম্পর্কের পসিমিকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার চন্দ্রনাথ তীর্থ পরভ্রমণ, অর্থ উপার্জনের জন্য বাংলাদেশের ফেনী শহরে এক উকলিবাবুর বাসায় পাচকবৃত্তির

সময়, উকলিবাবুর আয়োজিত কালীপূজায় অলটোকিক ঘটনাসহ অসংখ্য বভিত্তি প্রকাশ হয়ে পড়লে রাম লোকালয়রে বভিন্দি এলাকায় নজিকে প্রচ্ছন্ন রখে এক স্বপ্নীল আধ্যাত্মিক জগতে বচিরণ করে দনিতপিত করতে থাকেন।

পারমাত্মিক জগতে নজিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার মানসে, অন-ররে অরুন'দ আর্ততি, ইচ্ছাহীন এক অভলিষে ঐশীশক্তির সাথে পরম পুনর্মলিনরে এক দূর্নবার আকর্ষণে কণ্টাকাকীরণ ঘনঅরণ্য গরিসিঙ্কট আচ্ছাদতি বহু পথ অতিক্রমে বালক রাম পৃথিবীর অন্যতম মহাশক্তির আধার শক্তপীঠ কামরূপ কামাখ্যার তীর্থপীঠে বাৎসরিক অম্বুবাচরি উৎসবে দৈবিক তৃষতি-মর্মর-হৃদয় আকাঙ্ক্ষতি মহালগনের অপেক্ষায় জপরত ছিলেন। এই মহাতীর্থে শ্রীশ্রী ঠাকুররে সাথে তাঁর গুরুদবে “শ্রীঅনঙ্গদবে”-এর সাথে প্রথম সশরীরে সাক্ষাৎ হয়। গুরুর সাথে সাক্ষাৎ পরবর্তীতে শ্রীশ্রী ঠাকুর আনুষ্ঠানিক দীক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং হিমালয় পরভ্রমণ শুরু হয়।

তপস্য়াপুত হিমালয় পরভ্রমণরে সময় তাঁর গুরুদবেরে অতপ্রাকৃত অলটোকিক শক্তির কৃপাবলে অসংখ্য অতপ্রাকৃত সাধনক্ষেত্র, সদ্ধিপীঠ, রহস্যময় দবে-দবৌ, বহু ব্রহ্মবদি মহাপুরুষরে দূর্লভ সান্নিধ্যলাভ করে নজিকে পরপূর্ণ এক ব্রহ্মবদি হিসেবে ধরাধামে পারমাত্মিক লীলার অমৃতধারা প্রবাহতি করার নয়তির এক অদম্য ইচ্ছার প্রতফিলনে ঐশীশক্তির মহামলিনরে এক মহাদায়তিব নয়িতে তনি লোকালয়ে ফরে আসেন।

গুরুদবে-এর স্বরূপ সত্তার ছোঁয়ায় উজ্জীবতি হয়ে শ্রীশ্রী ঠাকুর সাধনজগতরে বচিত্রিক লীলাকে তাঁর পরভ্রমণরে পাথয়ে করে নলিনে এবং গুরুর আদেশকে শরোধার্য করে পাপভারাক্রান- বদেনার পঙ্কলি আবর্ততি জীবকে পরমানন্দরে পরমাত্মায় মহামলিনরে এক অব্যর্থ পরব্রাজনে নজিকে উৎসর্গ করলেন। সেই থেকেই তনি পৃথিবীর অন্যতম সাধনপীঠ ও মহাসাধকদরে পদচারণায় ধন্য অবভিক্ত ভারতরে একটা বশিষে অংশে বভিন্দিভাবে অবহলেতি মানবতার মানবকিতাকে জাগ্রত করার মানসে তাঁর অভিযাত্রা শুরু করেন। তনি মানবকিতার পঙ্কলি আবর্তে নমিজ্জতি মানুষরে ঘরে ঘরে গয়ি মানবতার আধ্যাত্মিক মহামুক্ততি কবৈল্যপ্রাপ্তির জন্য “শ্রীনাম” বতিরণ শুরু করেন। “কলকিলে মহামন্ত্রই একমাত্র জীবাত্মা ও পরমাত্মার মহামলিনরে পথ” এটাই শ্রীশ্রী ঠাকুররে অন্যতম বদেবাণী।

তনি আবর্ভাব থেকে তরোধান পর্যন- অসংখ্য পারমার্থিক লীলার বচিছুরতি আলোতে অধঃপতি মানবতাকে তাঁর ব্রহ্মবদিস্বরূপ প্রকাশ করে মানবতার আধ্যাত্মিক মুক্তির পথকে আরও সুগম করে দয়ি গেছেন। তাঁর জীবনটাই ছিল অন-হীন লীলার ভাণ্ডার। তাঁর দেহত্যাগরে বর্তমান প্রায় ৫০ বৎসর পরও ঐকানিক ভক্তদরে সাথে প্রতনয়িত ঐশ্বরিক শক্তির দবৈলীলার আলোতে প্রকটভাবে নজিকে অম্লান করে রেখেছেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুররে আদর্শকে লালন ও ধারণ করে পৃথিবীর বভিন্দি দেশরে বভিন্দি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছটিয়ে থাকা অসংখ্য একনষ্টি ভক্তরা “শ্রীনাম”-এর মহাশক্তিকে অবলম্বন করে তাদের নতি-জীবনকে কলুষমুক্ত করার মাধ্যমে পারমাত্মিক জীবনরে মহালয়ে আবৃত হওয়ার অদম্য আর্ততি প্রতনয়িত প্রার্থনা চালয়ি যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রী কবৈল্যনাথরে পরমকৃপার পরশে রামভক্তসহ সকল মানবাত্মা তাদের জীবন-চলার পথকে রামময় করে আনন্দলোকে উদ্ভাসতি হওয়ার অদম্য ইচ্ছায় কাজ করে যাচ্ছে।

দীর্ঘ প্রায় ৯০ বৎসররে জীবনরে অসংখ্য প্রকটলীলার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে সকল

ধরনের বৈষম্যহীন, কুসংস্কারমুক্ত সমাজ বনির্মাণে মানবতার মানবিক গুণাবলিকে জাগ্রত করে মানবতার আধ্যাত্মিক মুক্তির পথকে সুগম করার অভ্যুদয়ে শ্রীশ্রী ঠাকুরের আলোকিত জীবনে আলোকবর্তিকার বচ্ছুরতি আলোতে বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার চট্টামুহনী এলাকায় তাঁর ঐকানিক ভক্ত উপেন্দ্র সাহার বাংলাতে ১৩৫৬ বাংলার ১৮ বৈশাখ ১৯৪৯ ইং সালরে ১ মে, রববার, বেলো ১.৩০ মি. সময় পুণ্য অক্ষয়তৃতীয়া তথি়ি মাহেন্দ্রক্ষণে সত্যের পূজারি মহাসাধক শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দবে লক্ষ লক্ষ ভক্তপ্রাণকে নয়নরে জলে ভাসিয়ে মহাপ্রয়াণ করলেন। তিনি যে কক্ষে দেহত্যাগ করলেন সেখানে তাঁর সমাধিক্ষেত্রের নির্ধারতি হয় এবং সেখানে অপরূপ সোপত্যশলীতে অনিন্দ্যসুন্দর সমাধিমন্দির বর্তমান বদ্যমান। প্রতি বছর সেখানে তিরোধান দবিসে অক্ষয়তৃতীয়া তথি়িতে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগমে আনন্দময় পরবিশেষে এক বিশাল মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিয়ত অসংখ্য ভক্তপ্রাণ মানুষ শ্রীশ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে সমর্পিত হয়ে ত্রিপিপজ্বালা মোচনের এক অদম্য বাসনায় সমাধিক্ষেত্রের দর্শন করাই চলছে।

